কালের কণ্ঠ

08 JUN 2016

আবদুল মান্নান ▷

শিক্ষায় সম্ভাবনার পথ খুঁজতে হবে

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গলদ অনেক তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং এসবের সমাধান করতে হবে সে সম্পর্কেও কোনো বিতর্ক নেই। সেটি শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। অভিভাবকদের তাঁদের সন্তানদের আরো সময় দিতে হবে। শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শ্রেণিকক্ষে সঠিকভাবে পড়ালেখা হলে শিক্ষার্থীকে কেন কোচিংয়ে যেতে হবে? বঙ্গবন্ধুর কন্যা কি সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে পারেন

দেশের স্কুলের গণ্ডি পেরোনো শিক্ষার্থীরা একেবারে গণ্ডমূর্খ তা প্রমাণ করার জন্য একটি বেসরকারি টেলিভিশনের একজন রিপোর্টার ক্যামেরা নিয়ে কয়েক দিন আগে মাঠে নেমেছিলেন। পথে পাকড়াও করলেন তাঁর ভাষ্য মতে, সম্প্রতি ঘোষিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে জিপিএ ৫ পাওয়া ডজনখানেক শিক্ষার্থীকে। প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন এই শিক্ষার্থীরা জিপিএ ৫ পেয়েছে সত্য কিন্তু তারা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের তারিখটিও জানে না। চারদিকে ঢিটি পড়ে গেল। এমন জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের দিয়ে কী হবে? আবার একদল বিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি জানিয়ে দিলেন—এভাবে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জনগণের সামনে অপদস্ত করা একেবারেই অনৈতিক। কয়েকজন জানালেন, যে ছাত্রদের দেখানো হয়েছে তাদের মাত্র পাঁচজন জিপিএ ৫ পেয়েছে। একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানালেন, তাঁর স্কুলের যে কজন শিক্ষার্থীকে আসামির মতো ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানো হয়েছে তারা কেউ জিপিএ ৫ পায়নি। ধারণা করি, এ বিষয় নিয়ে এমন তর্ক-বিতর্ক-কুতর্ক আরো কয়েক দিন চলতেই থাকবে। বাঙালি তর্কপ্রিয় জাতি।

দেশের সর্বস্তরের শিক্ষার মান প্রত্যাশিত মানের নয়—এ বিষয় নিয়ে তর্ক করার কোনো অবকাশ নেই। সব পেশায় যেমন নিবেদিত পেশাদার মানুষ আছেন, ঠিক একইভাবে অপেশাদার দুর্নীতিপরায়ণ মানুষও সমাজে কম নয়। এটি সব দেশের পেশাদারদের বেলায় সত্য। যখন থেকে আমার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস হয়েছে, তখন থেকে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মওলানা আকরম খাঁ, মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুস সালাম, নির্মল সেন, ওবায়দুল হক, কে জি মুস্তাফা, তোয়াব খান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, বজলুর রহমান, সন্তোষ গুপ্তের মতো সাংবাদিক জগতের প্রবাদপুরুষদের সঙ্গে। অবশ্য তা তাঁদের লেখা পড়ে। পরবর্তীকালে তাঁদের দু-একজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগও হয়েছে। তাঁদের পেশাদারিত্ব যেকোনো মানুষকে অভিভূত করবে। তাঁদের বড় গুণ ছিল—তাঁরা কখনো নীতির প্রশ্নে আপস করেননি এবং সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোনো মিথ্যা বা শঠতার আশ্রয় নেননি। তাঁরা সবাই যে রিপোর্টার হিসেবে পেশায় প্রবেশ করেছেন তা কিন্তু নয়। কিন্তু যে সংবাদটি পত্রিকায় ছাপা হবে সে সম্পর্কে সজাগ থাকতেন, যদিও কোন সংবাদটি ছাপার যোগ্য তা নির্ধারণের ভার নিউজ এডিটরের। একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। একটি ইংরেজি দৈনিকের সাময়িকীতে একবার প্রয়াত শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর ওপর একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম। শিল্পীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। লেখার শিরোনামে আমি শিল্পীকে একজন আর্য হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম। দুই সপ্তাহ পার হলো লেখা আর ছাপা হয় না। একদিন সাময়িকী সম্পাদককে একটি মেইল পাঠাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে বলেন, শিরোনামে একটি বর্ণবাদের (Racism) গন্ধ আছে তা পরিবর্তন করে দিলে লেখাটি ছাপা হবে। আমি তাঁর এই দায়িত্ববোধ দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। এমন সাংবাদিক দেশে এখনো আছেন তবে তাঁদের সংখ্যা দ্রুত কমছে; তার কারণ—বাংলাদেশে দ্রুত বিকাশমান মিডিয়া জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেশাদার ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকের ঘাটতি বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এর ফলে একশ্রেণির উঠতি সাংবাদিকের জন্ম হয়েছে, যাঁরা মনে করেন তাঁরা একটি অর্ধসত্য বা বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করলে সবাই তাঁদের বাহবা দেবে। তাঁদের বিশ্বাস যেহেতু হাতে কলম বা মাইক্রোফোন আছে, সেহেতু ওটিকে তাঁরা অস্ত্র বানিয়ে যে কাউকে ঘায়েল করতে পারেন। অন্যদিকে পাল্টা চিত্রও আছে। যাঁরা বুঝতে পারেন কোনটি সংবাদ আর কোনটি অসত্য কল্পকাহিনী। দেশের শিক্ষার মান নিয়ে আমাদের সবাই চিন্তিত এবং সরকার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করছে। এ বছর বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে (১৫.৬ শতাংশ)। কিন্তু দেশে চাহিদার তুলনায় সার্বিকভাবে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকসহ শিক্ষার উপকরণ, জোগানের ঘাটতির কারণে মান রক্ষাসহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। এই যে শিক্ষার মান নিয়ে সবাই শিক্ষামন্ত্রী, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নির্দয়ভাবে দায়ী করছেন, তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা ভেবে দেখার সময় হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে তাঁদের সবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা কেউই অস্বীকার করবেন না। আমি সব সময় বলি, একজন শিক্ষার্থী যদি কোনো জানার বিষয় না জানে তার জন্য শিক্ষার্থীদের কখনো এককভাবে দায়ী করা উচিত নয়। মূল দায় নিতে হবে পরিবার, অভিভাবক আর শিক্ষকদের। আমার নিজের মা-বাবা তেমন একটা শিক্ষিত ছিলেন তা বলা যাবে না। তবে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করেছেন। বাড়িতে লেখাপড়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। বিনয়ী হওয়ার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মাগরিবের নামাজ পড়ে পড়ার টেবিলে বসেছি কি না তার খোঁজ নিয়েছেন। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নামাজ আর কোরআন তেলাওয়াত শেষ করে ৮টার সময় স্কুলের উদ্দেশে রওনার প্রস্তুতি নিয়েছি। কোচিং বলে কোনো শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। গ্রাম থেকে শহরে এসে কোনো একজন কিশোর কলেজে ভর্তি হয়ে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। পরিচিত ছিলেন লজিংমাস্টার হিসেবে। মাঝেমধ্যে তিনি অঙ্ক কষতে সাহায্য করতেন। বিকেলে বাড়ির কাছে মাঠে ফুটবল অথবা ক্রিকেট খেলার কথা মনে হলে এখনো সেই শৈশবে ফিরে যেতে মন চায়। ব্রিটিশ কাউন্সিল, পাবলিক লাইব্রেরি আর ইউএসআইএসের (বর্তমানে আমেরিকান সেন্টার) সদস্য হওয়ার সূত্রে স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার আগে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বেশির ভাগ ক্লাসিক শেষ করে ফেলেছি। আমাদের স্কুলের গ্রন্থাগারটি ছিল বেশ সমৃদ্ধ। সেসব সুযোগ কি আজকের ছেলেমেয়েদের আছে? যদিও তাদের সামনে আমাদের তুলনায় অন্য অনেক সুযোগসুবিধা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন জ্ঞানের রাজ্যটা হাতের আঙুলের ডগায় এসে গেছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—সেই সুযোগটা না পরিবার, না শিক্ষক ব্যবহার করার জন্য শিশু-কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পড়ালেখা এখন পরীক্ষা আর জিপিএমুখী হয়েছে, জ্ঞানমুখী নয়। পশ্চিমের অনেক দেশে স্কুলের শেষ পরীক্ষা হয় দশম শ্রেণিতে। তার আগে কোনো পরীক্ষা নয়। দক্ষিণ কোরিয়া আর ফিনল্যান্ডের স্কুলপর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বসেরা। ফিনল্যান্ডে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষা ও শিক্ষার একটা বড় অংশজুড়ে আছে কারিগরি শিক্ষা। দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও তাই। বাংলাদেশে এমন ব্যবস্থা চালু করলে পরদিনই অভিভাবকরা রাস্তায় নামবেন। বলবেন, আমার সন্তান কী বড় হয়ে মিস্ত্রি হবে? আমাদের সন্তানরা চেয়ার ডিজাইন অথবা তা বানানোর চেয়ে তাতে বসাটা বেশি পছন্দ করে। সমাজ ও পরিবারও তাই শিক্ষা দিয়েছে।

এ দেশের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার নাম করে এক ধরনের পরগাছা সৃষ্টির কারখানা স্থাপিত হয়েছে গত কয়েক দশকে। বলে—তারা বিলেত-আমেরিকার পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে। মাসে বেতন পাঁচ থেকে ১০ হাজার টাকাও হতে পারে। কোনো শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইলে তোমার দেশের একটি নদীর নাম বলো। অবলীলাক্রমে উত্তর আসে টেমস নদী। দোষ তো ওই শিক্ষার্থীর না। দোষ পরিবার, শিক্ষক আর স্কুল কর্তৃপক্ষের। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অনেক তরুণ বিশ্ব পরিমণ্ডলে নানা বিষয়ে চোখ ধাঁধানো অবদান রেখেছে। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া ওরা সবাই আমাদের দেশের সাধারণ ঘরের তরুণ, পড়ালেখা করেছে একেবারেই মধ্যবিত্তের 'নেটিভ' স্কুলে। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দিয়েছে ভিন দেশে, সেখানে সুযোগ পেয়ে তার মেধার বিকাশ ঘটিয়েছে। এমন একজন ড. রিফাত উল্লাহর কথা একটি ইংরেজি দৈনিক কয়েক দিন আগে প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপেছে। রিফাত এয়ারবাস আর বোয়িংয়ের জেট ইঞ্জিন ডিজাইনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। দেশে মেধার যদি এত আকাল হতো তাহলে কেমন করে রিফাত উল্লাহ বিদেশে এমন কীর্তি করতে পারেন? কেউ কেউ বলবেন, ওটা একটা ব্যতিক্রম। হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে রিফাত উল্লাহদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে সবাই মিলে চেষ্টা করলে ব্যতিক্রম নিয়মিত ঘটনাও হতে পারে। শুধু ক্যামেরা হাতে একজন নিম্ন মেধার রিপোর্টারকে কিছু কিশোরের পেছনে ছেড়ে দিলে তো হবে না।

কয়েক সপ্তাহ আগে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রথম পৃষ্ঠায় একটি ফটোফিচার প্রকাশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের দরজার সামনে ভোর থেকে পড়ুয়ারা ব্যাগ রেখে লাইন দিয়ে রেখেছে। যতজন পড়ুয়া এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে চায় ততজনের স্থান সংকুলান হয়তো হয় না। এটি অনেকে শুধু সমস্যা হিসেবে দেখবেন। কিন্তু এ রকম একটা চিত্র তো আমাদের আগামী প্রজন্মকে নিয়ে আমাদের আশার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে। গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব। এসব কাজে সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সহায়তা করতে সব সময় উদার। এক শনিবার গিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য অনুষদের একটি অনুষ্ঠানে। আমার ছাত্রজীবনের ছাত্র আন্দোলনের ফসল এই অনুষদ। করিৎকর্মা ডিন আমাকে তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থাগার ঘুরিয়ে দেখালেন। চমৎকার আয়োজন। শনিবার বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থাগারে তিল ধারণের স্থান নেই। এমন একটি গ্রন্থাগার বিশ্বের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সঙ্গে তুলনীয়। এই অনুষদের নতুন ভবন, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আর্থিক সহায়তা ছাড়াই সম্ভব হয়েছে। অর্থ জোগান দিয়েছে শিক্ষার্থীরা, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতসহ ছয়টি দেশের ১৪৫ জন বিদেশি শিক্ষার্থী পড়ে। এসব ইতিবাচক চিত্র কদাচিৎ মিডিয়ায় স্থান পায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা বছরে কবার বিদেশ গেলেন তার হিসাব দিতে অন্য আর একশ্রেণির মিডিয়া সদা তৎপর থাকে। কিন্তু ওই কর্মকর্তারা বিদেশে গিয়ে কী করলেন বা কেন গেলেন তার কোনো বৃত্তান্ত চোখে পড়ে না। দেশের এই শ্রেণির মিডিয়া দেশের বা কোনো সংগঠন বা সংস্থার কোনো ভালো কাজ জনগণের সামনে তুলে ধরতে যতটা কুণ্ঠিত, ততটা উৎসাহী যা অসত্য বা বানোয়াট তা তুলে ধরতে। যুক্তরাষ্ট্রের গ্যালপের এক জরিপে দেখা গেছে, সে দেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষ মনে করে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। অর্ধেক মানুষ তাদের প্রেসিডেন্টের নাম জানে না আর অর্ধেক মানুষ দেশটার রাজধানীর সঠিক নাম জানে না। নিজেদের সংবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ অর্ধেক মানুষ। তা নিয়ে সেই দেশের মিডিয়ার মাথা ঘামানোর সময় নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গলদ অনেক তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং এসবের সমাধান করতে হবে সে সম্পর্কেও কোনো বিতর্ক নেই। সেটি শুরু করতে হবে পরিবার থেকে। অভিভাবকদের তাঁদের সন্তানদের আরো সময় দিতে হবে। যেসব মা স্টার জলসা আর জি বাংলার নিম্নমানের সিরিয়াল না দেখলে জীবন বৃথা মনে করেন, তাঁদের ওখান থেকে একটু সময় বের করে সন্তানদের সঙ্গে কাটানোর কথা চিন্তা করতে হবে। বাবারা ব্যস্ত। কিন্তু সন্তানের জন্য সপ্তাহে দু-এক ঘণ্টা সময় তো বের করতে হবে। খাওয়ার টেবিলে নানা বিষয়ে আলোচনা সন্তানদের মনের জানালা খুলে দিতে পারে। শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শ্রেণিকক্ষে সঠিকভাবে পড়ালেখা হলে শিক্ষার্থীকে কেন কোচিংয়ে যেতে হবে? দেশে সুরিখানা বন্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর কন্যা নির্বাহী আদেশে সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে পারেন। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোয় কী শেখানো হচ্ছে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। একটি দামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস পড়ানোর জন্য বিদেশ থেকে একজন পণ্ডিত আমদানি করেছে বলে শুনেছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের হাঁত অনেক লম্বা। সরকারের চেয়ে কারো হাত লম্বা হওয়া উচিত নয়।

মিডিয়া জনগণের সামনে যেমন সমস্যার কথা তুলে ধরবে, ঠিক একইভাবে সমাধানের পথ দেখানোরও চেষ্টা করবে। এই বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা গণিত অলিম্পিয়াড থেকে শুরু করে অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভালো করে। সেই সব সংবাদ গণমাধ্যমে তেমন একটা আসে না। কে সিজিপিএ ৫ পেয়েও একজন নিম্নমানের মেধাশূন্য তরুণ তা দেখাতে পারলে একশ্রেণির গণমাধ্যম মনে করে কেল্লা ফতে। পরীক্ষার ফলাফল সব সময় মেধার মাপকাঠি হতে পারে না। বাংলাদেশের অনেক প্রথিতযশা পণ্ডিত আছেন যাঁরা ছাত্রজীবনে কখনো প্রথম শ্রেণি পাওয়া শিক্ষার্থী ছিলেন না। কোনো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডিও করেননি। কিন্তু দেশে ও দেশের বাইরে তাঁরা এখনো তাঁদের পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মানিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা আছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সমাধান সম্ভব।

লেখক : গবেষক ও বিশ্লেষক।